৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

# বিজ্ঞান অন্বেষক

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৪ সংখ্যা ২ মার্চ-এপ্রিল/২০০৭ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

## উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি জলাশয়

**ভূমিকা :** আজও উত্তর ২৪ পরগনায় ছড়িয়ে আছে বহু জলাভূমি। মাছ চাষ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হওয়ায়, জলাভূমি আজ কর্মব্যস্ত অর্থনীতির হাতিয়ার। কৃষির চাপে, হাট-বাজার/বাণিজ্যের প্রয়োজনে, গৃহ নির্মাণের তাগিদে জলাভূমি কী যে দ্রুততায় হারিয়ে যাচ্ছে, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। যেদিন মানুষ সহজে জল তোলার পদ্ধতি (নলকূপ) আবিষ্কার করল, সেদিন থেকে পুকুর-খাল-বিল-বাঁওড় তার গুরুত্ব হারিয়েছে। দেড় হাজার টাকা খরচ করলেই একটা নলকূপ বসিয়ে নেওয়া যায়। একটা পুকুর কাটাতে ন্যূনতম খরচ ৫০,০০০ টাকা। ঘাট বাঁধাতে আরও ২৫-৩০,০০০ টাকা। পুকুর রক্ষণাবেক্ষণে খরচও প্রচুর। তুলনায় নলকূপের কোনও খরচ নেই। সহজতম প্রযুক্তি।

নৌকা তার গুরুত্ব হারালো লরি-বাস-টেম্পো-ট্রেকার চালু হওয়ায়। নদীর নাব্যতা রক্ষায় মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। ট্রেন ব্যবস্থা নদীর মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। যা হবার তাই হচ্ছে।

এই নিবন্ধে উত্তর ২৪ পরগনার চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁওড়-জলাশয়ের প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

### জলাশয় -১ : নাংলা বিল

**১। অবস্থান :** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া রেলস্টেশন থেকে দক্ষিণে জয়গাছির ২ নং রেল

এরপর ৪ পাতায়

## রোগ-চিকিৎসায় কুসংস্কারের বাধা

দেশ থেকে পোলিও (পোলিওমায়েলাইটিস) রোগটি দূর করার জন্য কিছুদিন অন্তর দেশের পাঁচবছরের কমবয়সী শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছে। ঐ সময় মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে বেরোয় দু'একটি এলাকার কিছু মানুষ তাঁদের বাচ্চাকে এই টিকা খাওয়াচ্ছেন না। তাঁদের বিশ্বাস এর ফলে শিশুটি ভবিষ্যতে বন্ধ্যা হয়ে যাবে অর্থাৎ তার আর কোনও বাচ্চাকাচ্চা হবে না। সম্পূর্ণ মিথ্যা এই ধারণাটি কিভাবে সৃষ্টি হল বলা মুস্কিল। তবে বিশেষত অশিক্ষিত, হতদরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষের মধ্যেই মূলত এই ধরনের কুসংস্কার দেখা যায়। আর পেছনে যথাসম্ভব এলাকার কিছু মূর্খ, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধর্মীয় নেতার উস্কানি ও আর এই ধরনের প্রচার কাজ করে যে, ব্যাপারটি এ দেশের মুসলিম জনসংখ্যা কমানোর ষড়যন্ত্র। ভিত্তিহীন ও হাস্যকর এই ধরনের কথাবার্তা আর বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, মা হয়তো তাঁর শিশুকে পোলিওমুক্ত করার জন্য টিকা খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার বিনিময়ে বাবার কাছ থেকে জুটছে প্রহার, এমনকি তালাকের হুমকিও। এই ধরনের ঘটনার বিবরণও সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে।

এই ধরনের মিথ্যা ধারণা, সংকীর্ণ প্রচার আর কুসংস্কারের ফলে যা হয় তা হল কিছু শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো যায় না। ফলে রোগটির উৎস থেকেই যায়। তাই এখনো মাঝে মাঝেই এ দেশে ঘটে পোলিওমায়েলাইটিস রোগের আক্রমণ। যে শিশু আক্রান্ত হয় সে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। একবার হয়ে গেলে তার আর কোন চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ থাকে না। নিছক অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের কারণে দেশের একটি শিশুও যদি পঙ্গু হয় তবে তা অত্যন্ত বেদনার। আর আমাদের দেশে শুধু তো এই পোলিও টিকা প্রসঙ্গে নয়, কুসংস্কারের কারণে আরো বহু ক্ষেত্রেই রোগের চিকিৎসা ঠিক সময়ে হয় না, রোগ প্রতিরোধ করা যায় না, বহু রোগ জটিল থেকে জটিলতর হয়। পাশাপাশি ঘটে অহেতুক অর্থব্যয়, হয়রানি, সময়ের অপচয় আর প্রতারিত হওয়া। এই ধরনের ছোটবড় অজস্র উদাহরণের কয়েকটিকে এখানে আলোচনা করা যায়।

**ভূত ও দেবতার ভর :** মাঝে মাঝেই শোনা যায়, বিশেষত কমবয়সী কোন মেয়ের উপর নাকি ভূত বা বিশেষ কোন দেব-দেবীর ভর হয়েছে। মেয়েটি অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে, অজ্ঞান হয়ে মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে, ঘোরের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ভবিষ্যদবাণী করে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চালায়। সাধারণত গ্রামেগঞ্জে বস্তিতে দরিদ্র, স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর মেয়ে বা গৃহবধূরা এ ধরনের অবস্থার শিকার হয়। আর অবশ্যই তারা ভূত-প্রেত-দেব-দেবীতে গভীর বিশ্বাসী হয়ে থাকে, সঙ্গে থাকে কিছু পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনা, অবহেলা বা নিপীড়নের ঘটনাও। আশপাশের মানুষজনও ব্যাপারটিকে ভর হিসেবে ধরে নিয়ে চলে ওঝা-গুণিন দিয়ে অমানুষিক চিকিৎসা। ঝাঁটাপেটা করা, লঙ্কা গুড়িয়ে তার ঝাঁঝ নাকে দেওয়া, শেয়ালের পায়খানা জোর করে

এর পর ২ পাতায়

## রেবে অরুণাচলের সম্পদ

গোটা সিকিম এবং কালিম্পং হিমালয় মাঝে মাঝেই বিলুপ্ত প্রায় পাখির পুনর্দৃশ্যে খবরের কাগজে স্থান করে নিয়েছে। কোন কোন পাখির নাম জড়িয়ে গিয়েছে সালিম আলির নামের সঙ্গে। অরুণাচল প্রদেশেরও উচ্চশৃঙ্গে দেখা মিলেছিল অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির পাখির। সেকারণেই হিমালয়ের গূঢ়তম প্রান্তে এমন পাখি দেখা গিয়েছে, যা গোটা পৃথিবীর মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য। কোন্ পরিবেশ যে কোন প্রজাতির পাখিকে ধরে রাখে, সেটাই গভীর বিস্ময়ের।

অরুণাচল প্রদেশের সুবর্ণ সিঁড়ি জেলার লিগু গ্রামে ১০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এমনই এক উদ্ভিদের দেখা মিলেছে। বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতির উদ্ভিদের নামকরণ করেছেন *বেগনিয়া টেস্‌সারিকার্পা*। বলা যায় ফিরে পাওয়া উদ্ভিদটি *বেগনিয়া টেসসারিকার্পা* ভুক্ত (*Begonia tessaricarpa*)।

অরুণাচল প্রদেশের দুই আদিবাসী সম্প্রদায় তাগিন এবং আদি'রা শরীরের জলাভাব এবং হজমের গোলমালে এই উদ্ভিদকে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করত। এই উদ্ভিদের চলতি নাম

এর পর ৬ পাতায়

# রোগ চিকিৎসায় কুসংস্কার

১ পাতার পর

খাওয়ানো, পুরনো জুতো শোঁকানো, মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা — এলাকা বিশেষে এই ধরনের নানাবিধ টোটকা 'চিকিৎসা' চলে। সঙ্গে থাকে যাগযজ্ঞ, পূজাআচ্চা, মন্ত্রপড়া, মন্ত্রপূত চাল বা পাথরের টুকরো ছোঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি হল প্রায় সবক্ষেত্রেই মেয়েটি এক মানসিক রোগের শিকার, যার নাম হিস্টোরিয়া। (এই হিস্টোরিয়া নামটিও অবশ্য একটি ভুল ধারণার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আগে ভাবা হত রোগটি শুধু মেয়েদের হয় এবং মেয়েদের জরায়ু ক্ষেপে গেলে দেখা দেয়। জরায়ু-র গ্রীক প্রতিশব্দ 'হিস্টেরস' থেকে তাই নামটি করা হয়েছিল হিস্টোরিয়া। কিন্তু ব্যাপারটি শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও হতে পারে, যদিও আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে মেয়েদের মধ্যেই তার প্রাদুর্ভাব বেশি। আর জরায়ু-র সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। রোগটি সম্পূর্ণই মানসিক তথা মস্তিষ্কগত।) কিছু ওষুধপত্র, মনোচিকিৎসা, অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি ধরনের চিকিৎসার ফলে তা সারিয়েও তোলা যায়। কিন্তু ভূতের ভর বা দেবতার ভর ভেবে সময় নষ্ট করলে এবং রোগীর উপর অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার চালালে, তা স্থায়ী মনোবৈকল্যের সৃষ্টি করতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু বা স্থায়ী অঙ্গহানিও ঘটে। এ ব্যাপারটা আটকাতে গোড়াতেই মনে রাখা দরকার ঐভাবে 'ভর' হয়ে এটি ঘটে না। তার সহজ কারণ ভূত-প্রেত বা দেবদেবী বলে কোনকিছুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ঐ ধরনের কোন অপশক্তি বা দৈবশক্তি কোনদিন ছিলও না। তাই তাদের প্রভাবে কোন শারীরিক-মানসিক বৈকল্য বা অন্য কোনও কিছু ঘটনা সম্ভব নয়। আমাদের প্রাণের পেছনে রয়েছে অসংখ্য জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, আত্মা নামক কোনকিছু নয়। আত্মা যেহেতু নেই, তাই প্রেতাত্মা বা ভূতপ্রেত বলেও কোনওকিছু হতে পারে না। একইভাবে দেবদেবী বলেও কোনও কিছু নেই। আত্মা, ঈশ্বর বা দৈব শক্তি তথা দেবদেবী— এসবই মানুষের নিছকই কল্পনার ফসল। আমাদের মনোলোকেই শুধু তাদের অবস্থান। অন্য কোন প্রাণীর মনোলোকেও যেমন, তেমনি বাস্তবেও তারা অস্তিত্বহীন। তাই তাদের ভর হয়ে ঐ ধরনের ফিট, অসংলগ্ন আচরণ ও কথাবার্তা ইত্যাদি হওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত শিক্ষা, আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এসবের ফলে মেয়েদের উপর লাঞ্ছনা যেমন কমবে, তেমনি ভূত-প্রেত-দেবদেবীর উপর বিশ্বাসও কমবে। কমবে হিস্টেরিয়ার মত রোগের প্রকোপ এবং তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না করার পরিস্থিতিও।

**সাপের কামড়ে মন্ত্র আর বিষপাথর :** সাপে কামড়ানোর পর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর খবর মাঝেমাঝেই সংবাদপত্রে বেরোয়। না, নিছক বিনা চিকিৎসায় নয়। ঐ মৃতের 'চিকিৎসা' করা হয়েছিল জড়িবুটি, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বা কামড়ের জায়গায় বিষপাথর বসিয়ে। আর 'চিকিৎসক'-এর ভূমিকা পালন করে ওঝা-গুণিনরা। এই মৃতের তালিকায় সাপুড়ে, এমনকি ওঝা-গুণিনও থাকে। কখনো আবার এইভাবে মারা যাওয়ার পর মৃতদেহটিকে কলার ভেলায় নদী বা খালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আশা করা হয় মা মনসার কৃপায় প্রাণ ফিরে আসবে। না, প্রাণ কখনোই ফেরে না, মাঝখান থেকে মড়াটি পচেগলে কাক-শকুনের খাবার হতে থাকে। কখনো আবার মড়াটি নিয়ে বাড়ির লোক মনসা মন্দিরের সামনে হত্যে দিয়ে বসে, যদি দেবীর অলৌকিক অনুগ্রহে প্রাণ ফিরে আসে। এরও ফল একই। বাসি মড়ার পচন ও গলন। আর এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাই উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়।

অথচ এইসব সর্পদ্রষ্ট মানুষকে যদি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেত, তবে সেখানে অ্যান্টিভেনিন প্রয়োগ করে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হত। একমাত্র এই অ্যান্টিভেনিন বা অ্যান্টি ভেনম সিরামই শরীরে সাপের বিষকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। কোন জড়ি বুটি, মন্ত্রতন্ত্র, বিষপাথর, মাথায় জল ঢালা— এসব কোনভাবেই তা দূর যায় না। সাপের বিষ এক ধরনের প্রোটিন। বিষধর সাপ কামড়ে উপযুক্ত পরিমাণ বিষ যদি শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে তা রক্তে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। তাই কামড়ের জায়গায় বিষপাথর বা জড়িবুটি লাগিয়ে এই বিষ শুষে নেওয়া সম্ভব নয়। মাথায় ঘড়াঘড়া জল ঢেলে বা মন্ত্র পড়েও তা নিষ্ক্রিয় হয় না। মাঝখান থেকে এসবের ফলে সময় নষ্ট হয়। ততক্ষণে বিষের প্রভাবে মস্তিষ্ক অপরিবর্তনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেমন কালাচ, কেউটের বিষ থেকে) বা রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যায় (যেমন চন্দ্রবোড়ার বিষে)। তখন আর ঐ রোগীকে বাঁচানোর সুযোগও থাকে না। অথচ সাপে কামড়ানো মাত্র কামড়ের জায়গার একটু উপরে মাঝারি চাপে বাঁধন দিয়ে, রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রেখে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টিভেনিন দিয়ে তাকে বাঁচানো সম্ভব হত।

**রোগ চিকিৎসায় গ্রহরত্ন :** জ্যোতিষবিদ্যা আর তার নির্দেশিত গ্রহরত্নের ব্যাপারগুলি যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও প্রতারণামূলক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতীতে আমাদের পূর্বসুরীরা ভেবেছিলেন মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান গ্রহ নক্ষত্রও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘোরাঘুরি করে এবং 'তাঁর' ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই পৃথিবীতে মানুষের জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়। আর ঐ কারণেই ভাবা হয়েছিল কারোর জন্মমুহূর্তে আকাশে গ্রহনক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানের সঙ্গে জাতক-জাতিকার ভবিষ্যৎজীবনের সম্পর্ক থাকে। মূল এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে জ্যোতিষবিদ্যার নানা বিস্তারিত দিক। এর একটি হল আকাশের বিশেষ গ্রহের কুদৃষ্টি বা কুষিত হওয়ার কারণে বিশেষ রোগব্যাধি (বা অন্যান্য বিষাক্ত) ঘটে এবং তাকে শান্ত করার জন্য বিশেষ পাথর (গ্রহরত্ন) শরীরে ঠেকিয়ে রাখলে অর্থাৎ ধারণ করলে ঐ ব্যাধি সারানো যাবে (বা চাকরি না পাওয়া, বিয়ে বা সন্তান না হওয়া, মামলা না জেতা ইত্যাদির মত বিপদও এড়ানো যাবে)। আর এইভাবেই অর্শ, হাঁপানি, বাতব্যথা ইত্যাদি ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগেভোগা বহু ব্যক্তির হাতে বা কোমরে দেখা যাবে পলা, নীলা, গোমেদের মত নানাবিধ তথাকথিত গ্রহরত্নের বোঝা।

আগে যা ভাবা হয়েছিল এখন জানা গেছে, আমাদের পূর্বসূরীদের ঐসব ভাবনা ও কল্পনা ভুল ছিল। স্থূল পর্যবেক্ষণ থেকে, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা ঐ সব কাল্পনিক সিদ্ধান্তের পরিমার্জনা করা যে প্রয়োজন তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকা ওইসব গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি যে যৎসামান্য মহাকর্ষ বল আমাদের উপর প্রয়োগ করে শরীরের উপর তার কোনও প্রভাবই পড়ে না কিংবা পড়লেও তা এতই দুর্বল যে মলদ্বারের রক্তবহনালিকার স্ফীতি ঘটিয়ে অর্শ বা গাঁটের হাড়ের প্রদাহ ঘটিয়ে বাতব্যথা সৃষ্টি করতে পারে না। সর্বোপরি ঐ বলের চরিত্র সব গ্রহেরই সমান। মঙ্গল গ্রহের মহাকর্ষ বল অর্শ ঘটাবে বা শনিগ্রহের বল হাঁপানি সৃষ্টি করে — এমনটি আদৌ নয়।

আর পলা-নীলা জাতীয় তথাকথিত গ্রহরত্নগুলিও কিছু খনিজ বা সামুদ্রিক রাসায়নিক পদার্থ। সেগুলি গুঁড়ো করে নিলে হয়তো তবু শরীরে ভালমন্দ যাইহোক কিছু হোত। কিন্তু হাতে আংটি করে বা তাবিজ বেঁধে কিংবা ঘুনসি করে পরে শুধু স্পর্শগুণে কোন শারীরিক প্রভাবই পড়ে না, নিছক 'কিছু একটা পরে আছি' জাতীয় বিশ্বাস থেকে মানসিক কিছু প্রভাব ছাড়া। মাঝখান

এরপর ৩ এর পাতায়

# রোগ চিকিৎসায় কুসংস্কার

২ পাতার পর

থেকে যা হয় তা হল ঐ রোগগুলি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সাহায্যে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সারিয়ে তোলার উদ্যোগই নেওয়া হয় না বা বিলম্বিত হয়।

**রেইকি** : বস্তাপচা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা কিভাবে আধুনিকতার মোড়ক পরিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় আর প্রতারণামূলক ব্যবসা করা যায় তার অন্যতম একটি উদাহরণ এই রেইকি। রেইকি মাস্টার নাকি হাত দিয়ে ছুঁয়েই রোগীর রোগ সারিয়ে দেন। তাই এর আরেক নাম স্পর্শ চিকিৎসা। বলা হয় রেইকি মাস্টার বিশেষ ক্ষমতায় হাত দিয়ে মহাজাগতিক শক্তি বা রশ্মি আঁকড়ে রোগীর শরীরে চালান করেন এবং এইভাবে রোগ সেরে যায়। কিছুদিন আগে এক বহুল প্রচারিত মেয়েদের পত্রিকায় এক রেইকি মাস্টারণী দাবী করেছিলেন যে, শুধু রোগ সারানো নয় ঐ শক্তির সাহায্যে তেল ছাড়া কিছুদূর অব্দি গাড়িও চালানো যায়, খারাপ হয়ে যাওয়া মিক্সি বা অন্য যন্ত্রপাতি সারানো যায় ইত্যাদি আর হ্যাঁ, এমন সব হাস্যকর কথাবার্তা মেনে নেওয়ার মত লোকেরও অভাব নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, ঐভাবে হাত দিয়ে কোনও মহাজাগতিক শক্তি পাকড়ানো কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, তা দিয়ে রোগ সারানো তো আরো অসম্ভব। জ্যোতিষবিদ্যার মত রেইকি সংক্রান্ত কথাবার্তাও কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন ধ্যানধারণার ফসল, যা এখন ভুল বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে নিছক স্পর্শের দ্বারা কষ্ট কমানো যায় না। যেমন সাধারণ মাথা ধরা বা মাথা ভারি ভারি লাগায় মায়ের বা অন্য কারোর স্নেহময় স্পর্শ অনেক আরাম দেয়। প্রিয়জনের স্পর্শ অনেক কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে ওই মহাজাগতিক শক্তি বা কসমিক রে পাকড়ানো এবং শরীরের বিশেষ স্থান দিয়ে তা রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে হাঁপানি থেকে ব্রেন টিউমার সারিয়ে দেওয়ার মত হাস্যকর দাবির কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই রেইকি নামক অপবিদ্যার সঙ্গেও। কিন্তু রেইকি মাস্টার বা মাস্টারণীর মত কারোর আশ্বাসে গভীর আস্থার কারণে যদি মূল রোগটির প্রকৃত চিকিৎসা না করিয়ে বিলম্ব করা হয় তবে রোগটি জটিল থেকে জটিলতরই হবে। আরও হবে অর্থদণ্ড আর প্রতারিত হওয়ার অবমাননাও।

**জন্ডিসের মালা** : জন্ডিস হলে গলায় এক ধরনের মালা পরানোর চল এখনও বেশ চালু আছে। বলা হয় যত সময় যাবে মালাটি আস্তে আস্তে বাড়বে, জন্ডিসও সারবে। বিশেষ এক গাছের সরু সরু ডাল ছোট ছোট করে কেটে বিশেষ কায়দায় বাঁধা হয় এবং তার মালা গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। পরানোর সময় তা থাকে বেশ ছোট। কোনরকমে মাথা গলিয়ে পরানো যায়। ৫-৭ দিনের মধ্যে দেখা যাবে ওই মালা প্রায় নাভি অব্দি চলে এসেছে। সঙ্গে জন্ডিসও কমে গেছে।

এব্যাপারটিও সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা ওই মালাটি দেয় তারা একটি বিশেষ কায়দায় ঘন করে ওই সরু সরু ডালগুলি বাঁধে। এই বাঁধনকে বলা হয় সিফার্স নট বা সেলরস নট (Schiffer's বা sailor's knot)। জাহাজঘাটায় জাহাজ আটকাতে এই ধরনের বাঁধনই ব্যবহৃত হয়। আর যে গাছের কাঁচা ডাল ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত আপাং বা মহাভৃঙ্গরাজ। এদের সরু ডালের ভেতরটা ফাঁপা। এর থেকে মালা বানানো হলে আস্তে আস্তে কাঁচা ডাল শুকোতে থাকে, ভেতরের ফাঁপা অংশটা বন্ধ হতে থাকে অর্থাৎ ডালটি সরু হতে থাকে। আর বাঁধনের কায়দাটিও এমন যে, ডাল সরু হলেও বাঁধনটি আলগা হয় না। ফলত মালাটি আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে। যথেষ্ট সংখ্যক টুকরো নেওয়ার ফলে এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির মাত্রা নেহাৎ কম হয় না। যে সুতো দিয়ে মালা গাঁথা হয়েছিল ওই মূল সুতোর মোট দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এতগুলি টুকরোর মোট বেড় অনেক কমে যাওয়ায় মালার এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি। আপাতদৃষ্টিতে একে রহস্যময় মনে হয়। আর এখানেই সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বেড়ে যায়। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহ যে, এইভাবে মালা বাড়লেও জন্ডিস সারানোর সামান্যতম ক্ষমতা তার নেই।

তবু দেখা যায় মালা পরার ৫-৭ দিনের মধ্যে জন্ডিস কমে যায়। এক্ষেত্রেও মালার সামান্যতম মাহাত্ম্য নেই। জন্ডিস সাধারণত হয় যকৃতের ভাইরাসঘটিত প্রদাহের কারণে (হেপাটাইটিস) আর প্রধানত হয় 'হেপাটাইটিস-এ'। এই ধরনের ভাইরাস আক্রমণ শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতায় কয়েকদিনের মধ্যে আপনা থেকেই সেরে যায়। শুধু দরকার হয় সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি (ক্যালরি)-র যোগান। তাই জন্ডিসের ঐ মালা পরা হোক বা না হোক 'হেপাটাইটিস-এ' ঘটিত জন্ডিস আপনা থেকে কমবেই। আর ঐ মালা জন্ডিসের রোগী বলে নয়, গরু ছাগলের গলায় বা দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলেও কয়েকদিনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাবে।

কিন্তু মুস্কিল হবে অন্য জায়গায়। হেপাটাইটিস-এ ছাড়া জন্ডিস হয় অন্যান্য নানা কারণেও। যেমন 'হেপাটাইটিস-বি' বা 'সি', পিত্তনালী পাথর দিয়ে আটকে গেলে বা স্থানীয় কোন টিউমারের কারণে পিত্তনালীর পথ রুদ্ধ হলে, রক্তের লোহিত কণিকা কোনও কারণে ভেঙ্গে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপদ ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতায়, কিছু সতর্কতা নিলেই 'হেপাটাইটিস-এ'-র মত জন্ডিস আপনা থেকে সারবে না। বরং গলায় জন্ডিসের মালা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, রোগটি বেড়েই চলবে আর তার ফলে বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যুও অসম্ভব নয়।

(ক্রমশ)

*—ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু*

*লেখক বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের উদ্দেশ্যে বহুদিন ধরেই লিখছেন*


## ফর্ম : IV

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে :

১। **প্রকাশ স্থান** : ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

২। **প্রকাশকাল** : দ্বিমাসিক

৩। **প্রকাশক** : জয়দেব দে

৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৪। **সম্পাদক** : শিবপ্রসাদ সরদার

কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৫। **মুদ্রক** : জয়দেব দে

স্ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।

নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৬। **স্বত্বাধিকারীর নাম** : জয়দেব দে

৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

নাগরিকত্ব : ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

*তারিখ : ৮ মার্চ, ২০০৭*

জয়দেব দে

প্রকাশকের স্বাক্ষর

# উত্তর ২৪ পরগনার জলাশয়

১ পাতার পর

গেটের পাশ দিয়ে গোহালবাটী ও ফুলতলা গ্রাম পেরিয়ে নাংলা গ্রাম ও নাংলা বিল। হাবড়া রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব প্রায় ৫ কিমি। উত্তরে ফুলতলা পঞ্চায়েত, পশ্চিমে খারো পঞ্চায়েত, পূর্বে পাঁচঘরা পঞ্চায়েত এবং দক্ষিণে কুমড়ো-কাশীপুর পঞ্চায়েত। মছলন্দপুর রেল স্টেশন থেকে মগরা মোড় হয়ে নাংলা বিলে যাওয়া যায়। সংহতি রেল স্টেসনে নেমেও আসা যায়। দূরত্ব প্রায় ১.৫ কিমি।

**২। প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক তথ্যাদি :**

(ক) আয়তন — ৩০৭৬ বিঘা। (অন্যমতে, প্রায় ৪০০০ বিঘা)

(খ) বিল সংলগ্ন মৌজা — টুনিঘাটা, পাঁচঘরা, ফুলতলা।

(গ) সারা বছর জলা অংশের পরিমাণ ১৫০০ বিঘা। বর্ষায় ৮০ শতাংশই জলের তলায় চলে যায়।

(ঘ) ২০০ জন মৎস্যজীবী এই জলায় মাছ ধরে জীবিকা (আংশিক) নির্বাহ করেন। কোনও সমবায় সমিতি নেই।

(ঙ) ভালো বৃষ্টি হলে, বর্ষায় গভীরতা দাঁড়ায় ৮-১২ ফুট; গ্রীষ্মে ৩-৬ ফুট। বেশিরভাগটাই কচুরিপানায় ঢাকা।

(চ) আশপাশের জোকার বিল, খারোর বিল, পাখিমারা বিল, গোবরার বিল এবং আরও অনেক বিলের জল নাংলায় এসে মেশে। বিলটা হানার খাল দিয়ে বর্তমান পদ্মা নদীর সঙ্গে যুক্ত। পদ্মা পরে চারঘাটের কাছে যমুনায় মিশেছে।

(ছ) গ্রীষ্মে স্থানীয় অধিবাসীদের জবরদখল করা ভেড়িতে; জমিতে ব্যক্তি মালিকানায় মাছ চাষ, কৃষি কাজ হয়। কচু, পেঁপে, তামাক চাষ, ধান চাষ হতে দেখেছি।

**৩। বিলের জমি সংক্রান্ত বিরোধ, বিবাদ, মামলা :** স্বাধীনতার আগে এই বিল গোবরডাঙার জমিদারদের অধীনে ছিল। এদের থেকে লিজ নিয়ে মাছের চাষ হত। জমিদারি উচ্ছেদের পর নানা জটিল পন্থায় জমির মালিকানা বদল হয়েছে। বর্তমানে বেশিটাই ভেড়ি হিসাবে দখলীকৃত। প্রচুর ঘর-বাড়ি, চাষের কাজে জমি বেদখল হয়ে জলাশয়ের স্বাভাবিক চরিত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

**৪। বিলের উৎপত্তিগত ইতিহাস :** নাংলা বিলের সৃষ্টি পদ্মার মজাখাত থেকে বলে অনেকে মনে করেন। পদ্মা নদী নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার যমুনা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে হাবড়া-নগরউখড়া রোডের পশ্চিমপাড় বরাবর কাজলা, বনবনিয়া হয়ে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় এসে নাংলা বিলে মিশত। হাবড়ায় পদ্মা নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত। মগরা থেকে পদ্মার একটা খাল এসে নাংলার বিলে মিশেছে।

**৫। নাংলা বিল সংরক্ষণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি :**

(ক) বিলের সমগ্র এলাকা সংরক্ষিত খাস জমি হিসাবে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করতে হবে।

(খ) মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করে মাছ চাষের ও বিলের প্রাকৃতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

(গ) চারপাশের জমিতে পরিকল্পিত বনায়ন, বৃক্ষসৃজন করে পাখি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।

(ঘ) সংযুক্ত খালগুলির সংস্কার সাধন জরুরি। বিলের জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

(ঙ) প্রায় ৩ লক্ষ লোকের জলের (ভূগর্ভে) যোগান দিতে এই বিলের উল্লেখ্য ভূমিকা আছে। বৃষ্টির জল যাতে আরও বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

## জলাশয় - ২ : বেড়ির বাঁওড়

**১। অবস্থান :** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পাঁচপোতা এলাকার (গোবরডাঙা রেল স্টেশনের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৭ কিমি দূরে) নিকটেই অবস্থিত। সংলগ্ন মৌজা : রামনগর, পাঁচপোতা, ভাবাডাঙা, সগুনা। গোবরডাঙা রেল স্টেশন থেকে ৯৬ ডি বাস, অটো, ট্রেকারে বা ভ্যান রিক্সায় যাওয়া যায়। বনগাঁ থেকে ৯৬ সি বাসে আসা যায়। এটি বেড়ি-গোপালপুর বাঁওড় হিসাবেও সুপরিচিত।

**২। প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক তথ্যাদি :**

(ক) আয়তন — ১২৩২ বিঘা।

(খ) সংলগ্ন মৌজা — পাঁচপোতা, রামনগর, ভারাডাঙা, সগুনা, গোপালপুর, নারায়ণপুর, বেড়ি।

(গ) ইছামতী নদীর সঙ্গে সংযোগ আছে। গোলাকার অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বিশেষ। ৫-৬ কিমি দীর্ঘ একটি খালের দ্বারা ইছামতী নদীর সঙ্গে যুক্ত। মার্চ-এপ্রিলে ইছামতীর নোনা ঘোলা জলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে।

(ঘ) গ্রাম সগুনার কাছে একটি স্লুইস গেট আছে। নদীর সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এটির সংস্কার জরুরি।

(ঙ) বাঁওড়ের গভীরতা — গ্রীষ্মে প্রায় ১৫ ফুট গভীর, বর্ষায় ২৫ ফুট গভীর। জোয়ার-ভাঁটা হয়।

(চ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আছে। ২৫-৩০ জাতের চুনো মাছ মেলে। সদস্য সংখ্যা ৫৮৬। সমিতির পরিচালনায় মামলা-মোকদ্দমা চলছে। মাছের স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট। কচুরিপানা নেই।

**৩। উৎপত্তিগত ইতিহাস :** আনুমানিক কয়েকশত বছর আগে ইছামতী নদী থেকে বেড়ির বাওড়ের উৎপত্তি। এর অশ্বক্ষুরাকৃতি আকৃতি এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

**৪। বেড়ির বাঁওড় সংরক্ষণে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি :**

(ক) যেসব নালা-খাল-বিল হয়ে বৃষ্টির জল বাঁওড়ে ঢুকত, সেগুলির যথোপযুক্ত সংস্কার জরুরি।

(খ) স্লুইস গেট ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে বাঁওড়ে ইছামতীর নোনা জল যাতে না ঢোকে, তার ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন।

## জলাশয় - ৩ : গোবরডাঙার কঙ্কনা বাঁওড়

**১। অবস্থান :** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা পৌরসভার পূর্বদিকে খাঁটুরা, হায়দাদপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম এবং স্বরূপনগর থানার তেপুল-মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তেপুল, পাড়ুই, চাঁদপাড়া, পূবালী গ্রাম কঙ্কনা বাঁওড় জলাশয়কে ঘিরে রেখেছে। গোবরডাঙা রেল স্টেশন থেকে ভ্যান রিক্সায় ৫ মিনিটের পথ। এটি একটি আদর্শ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বিশেষ। এর ৭০০ মিটার দক্ষিণে যমুনা নদী প্রবাহিত।

**২। প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক তথ্যাদি :**

(ক) পূর্বের আয়তন — ২৯০ একর। বর্তমান আয়তন ২৬৭ একর।

(খ) জলাশয়টির মাঝবরাবর মাটি দিয়ে ভরাট করে পারাপারের রাস্তা তৈরি হয় ১৯৬২ সালে। এতে জলাশয়টির সমূহ ক্ষতি হয়।

(গ) গ্রীষ্মে পাড়ের দিকে জলের গভীরতা ৩-৪ ফুট; মাঝখানে ৮-১০ ফুট।

(ঘ) ১৪১টি মৎস্যজীবী পরিবারের ভরণপোষণ (বর্তমানে ২০০ প্রায়)

# উত্তর ২৪ পরগনার জলাশয়

৪ পাতার পর

হয় এই জলাশয় থেকে। ১৯৫৭ সালে এখানে মেদিয়া মৎস্যজীবী সমিতি গঠিত হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ পরিচালনার ত্রুটিতে মামলা শুরু হয়। সেই বিবাদের আজও মীমাংসা হয়নি।

(ঙ) ১৫ই আগষ্ট - ১৫ই সেপ্টেম্বর একমাস অনেকে হুইল ছিপে প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন টিকিট কেটে মাছ ধরে। টিকিট ১৫০ টাকা।

(চ) রত্না খাল দিয়ে (৭০০ মিটার দীর্ঘ প্রায়) যমুনা নদীর সঙ্গে যোগ রয়েছে। বর্ষার অতিরিক্ত জল এই খাল দিয়ে যমুনায় চলে যায়। আবার বিশেষ সময়ে যমুনার জল এতে ঢোকে। তখন রসনা চিংড়ি, ট্যাংরা, কই এসব মাছ বেশি পাওয়া যায়।

(ছ) ৩০ জাতের চুনো মাছ মেলে। তবে সরম পুঁটি, আড়, ভ্যাদা, চেলা, গজাল, বোয়াল এবং অনেক চুনো মাছ হারিয়ে গেছে। পুঁটি, মৌরাল্লা, চাঁদা, খলসে, বেলে, পাঁকাল, কাঁকলে, বান, সিঙ্গি, মাগুর, ল্যাটা, চ্যাঙ, শোল, উলকো খুব কমে গেছে। রাসায়নিক দূষণ ও নিংড়ে মাছ ধরা এর প্রধান কারণ। ১৯৬০-এ কচ্ছপ মিলত। এখন নিশ্চিহ্ন।

(জ) অন্তত ৫০ প্রজাতির পাখি দেখা যেত এর ধারে। এখন ২০-২২টির বেশি নেই। শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক কমছে। অনেক জলজ উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন। জলের দূষণ বেড়েছে। চারধারের নিরিবিলি পরিবেশ উধাও।

**৩। কঙ্কণা বাঁওড়ের পরিবেশগত সঙ্কট :**

(ক) পলি পড়ে বাঁওড় ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

(খ) কৃষির জন্য বাঁওড়ের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

(গ) যেসব খাল, নালা দিয়ে বাঁওড়ে জল ঢোকে, সেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) চুনো মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সঙ্কট সৃষ্টি। বর্ষার সময় স্রোতের উজানে চুনো মাছ খাল-বিলে ঢোকে; সেখানে ডিম পাড়ে। ফের বৃষ্টিতে আবার বাঁওড়ে ফিরে আসে। পুঁটি মাছ এভাবেই ডিম পাড়তে অভ্যস্ত। ৪-৫ জাতের পুঁটি মাছ ছিল। এখন সব কিছুই প্রায় অবলুপ্তির পথে।

(ঙ) জলাশয়ের চারধারের নির্জনতা উধাও।

**৪। কঙ্কণা বাঁওড় সংরক্ষণে যেসব পদক্ষেপ জরুরি :**

(ক) সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(খ) মামলার নিষ্পত্তি ঘটিয়ে জলাশয়ের উন্নতি বিধান।

(গ) মাটি কেটে বাঁওড়ের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(ঘ) বৃষ্টির জল অধিক সংরক্ষণে প্রয়াসী হওয়া।

## জলাশয় ৪ : ডুমার বাঁওড়

১। **অবস্থান** — উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাঁদপাড়া রেল স্টেশনে নেমে ভ্যান রিক্সা, অটোয় যাওয়া যায়। দূরত্ব ৫ কিমি প্রায় (পূর্ব দিকে) বনগাঁ থেকেও আসা যায়। অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ উত্তর ২৪ পরগনার সর্ববৃহৎ বাঁওড়। গাইঘাটা থানার অন্তর্গত। ডুমা, ঝাউডাঙা, কালোপুর, আংরাইল ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও মৌজা। জলাশয়ের ভিতরের ডাঙাজমি 'মেদের মাঠ' নামে পরিচিত (২০০ একর)। লোকবসতি আছে।

২। **প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক তথ্যাদি :**

(ক) আয়তন : ৭৭২ একর ৩৯ শতক (১৭২৮ বিঘা)।

(খ) ঝাউডাঙা অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন।

(গ) ইছামতী নদীর সঙ্গে ২ কিমি দীর্ঘ খালের দ্বারা সংযুক্ত। গ্রীষ্মে খুব নোনা জল ঢোকায় খালের মুখ মাটি দিয়ে আটকে দেয়। বর্ষায় আবার খুলে দেয়।

(ঘ) বাঁওড়ের চারধারের দৈর্ঘ্য (পরিধি) ১৩ কিমি।

(ঙ) ১৯৫৯ সালে স্থাপিত হয় ডুমা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:। সদস্য সংখ্যা ১০৮৮ জন (৬ জন মহিলা সদস্য)। মাছ চাষে যত্নশীল।

(চ) ২৯ একর জমিতে রয়েছে আংরাইল ফিশারমেন কো. অ. সো. লি.। এছাড়াও, ৩৩ একর জমিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্য সমবায় সমিতি।

(ছ) জলের গভীরতা— গ্রীষ্মে ৬-৮ ফুট। বর্ষায় ১৫ ফুট।

(জ) সমিতির বেতনভুক সদস্য ২০ জন। বেতন— মাসিক ২৫০০ টাকা। কচুরিপানা নেই। জলাশয় পরিষ্কার।

**৩। ডুমার বাঁওড়ের পরিবেশগত সঙ্কট :**

(ক) মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জলাশয়ের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এর নানারকম কুফল ক্রমশই প্রকট হচ্ছে।

(খ) ইছামতী নদী সংযোগকারী খালটি জীর্ণ। এর সংস্কার জরুরি।

(গ) নদীর নোনা জল বাঁওড়ের ক্ষতি করছে।

(ঘ) কৃষিকাজ ব্যবহৃত কীটনাশক বিষ জলের দূষণ ঘটাচ্ছে।

## সংক্ষেপে : একনজরে

১। **নদী ইছামতী** — উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলায় প্রবাহিত এই নদী (হিঙ্গলগঞ্জ অবধি)। তারপর সাতজেলিয়া বা গোসাবা পর্যন্ত একই নদী নাম পরিবর্তন করে হয়েছে কালিন্দী।

১৯৪২ সালে ১৮৮ নং রেলব্রীজের নিচে নদীর স্রোত কমাতে বোল্ডার ফেলা হয়। ফলে নদীর উৎস মুখ বুঁজে যায়। নদীর মৃত্যু শুরু হয়ে যায়। রেললাইন বসাবার কারণে সারা ভারতে একদিকে যেমন বহু নদীর মৃত্যু হয়েছে, তেমনি বন্যা-নিকাশী ব্যবস্থা চরম অব্যবস্থায় পৌঁছেছে।

নদীয়া জেলার পাবাখালি গ্রামে মাথাভাঙা থেকে নদী ইছামতীর জন্ম। মাথাভাঙা দুভাগে বিভক্ত হয়ে চুর্নী ও ইছামতী নামে প্রবাহিত।

নদী নিজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এই সহজ সত্যকে বিসর্জন দিয়ে প্রযুক্তির আস্ফালন দেখাতে গিয়ে আজ পরিবেশ সঙ্কট চরম আকার নিচ্ছে। নদীর প্রধান কাজ জল নিকাশী। বাঁধ দিয়ে, নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে সবটাই বারোটা বাজানো হয়েছে।

২। **নদী যমুনা** : নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে যমুনা নদীর গতিপথ। হুগলীর ত্রিবেণী সঙ্গমের বিপরীতে ভাগীরথী নদী থেকে শাখা নদী হিসাবে যমুনার উৎপত্তি। কাঁচরাপাড়া (বাঘের খাল), চৌবেড়িয়া, গাইঘাটা, জলেশ্বর, ইছাপুর, গৈপুর, গোবরডাঙা, চারঘাট হয়ে টিপি'র কাছে নদী ইছামতীতে মিলন।

শিয়ালদহ-রানাঘাট রেললাইন; মদনপুর স্টেশনের কাছে নদীতে বোল্ডার ফেলায় যমুনার মৃত্যু ঘোষিত হয়। এই নদী পূর্বে যথেষ্ট বেগবতী ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। গোবরডাঙা রেলব্রীজ; গোবরডাঙা কালীবাড়ির কাছে ভারী যান চলাচলের জন্য নির্মিত ব্রীজ যমুনার বিপুল ক্ষতি করেছে।

৩। **নদী বলদে ঘাটা** : চারঘাটের কাছে যমুনা থেকে উৎপত্তি। উত্তর মুখে গাজনা হয়ে চাঁদপাড়ার ডুমার বাঁওড়ে মিশেছে। প্রায় ২৫ কিমি দীর্ঘ এই নদী প্রায় মৃত।

৪। **নদী চালুন্দিয়া** : প্রায় ৫০ বছর আগে গোবরডাঙার মানুষের সামনে নদীটা হারিয়ে গেল। গাজনা থেকে উৎপত্তি হয়ে জামদানি, খাঁদুরা, গোবরডাঙা হয়ে যমুনায় মিশেছে ষষ্ঠীতলার কাছে। ১৫ কিমি দীর্ঘ প্রায় এই নদীপথে এখন অনেক নিচু জমি, পুকুরে দেখা যায়।

*—দীপক কুমার দাঁ*

# হরিপুরে পরমাণু শক্তিকেন্দ্র চাই না

পশ্চিমবঙ্গে আবার পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের দামামা বেজে উঠেছে। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এরকম একটি ধুয়ো তোলা হয়েছিল। তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নানা মহল থেকেই তার প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এমনকি শাসক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় সচেতন অনেকেও তার বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়। এখন আবার উন্নয়নের নামে পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুর থানা এলাকায় পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের গাজর ঝোলানা হচ্ছে। অথচ আগে যেসব কারণে এমন কেন্দ্রের বিরোধিতা করা হয়েছিল তার সবকটিই এখনো বর্তমান।

যেসবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে বাহুল্য মাত্র। শুধু সংক্ষেপে বলা যায় এই ধরনের শক্তি কেন্দ্রের প্রতিটি ধাপই তেজস্ক্রিয়তার জন্য চরম বিপজ্জনক, শুধু কারখানার কর্মী নয়, বহুদূর বিস্তৃত এলাকার হাজার হাজার মানুষ ও প্রকৃতির পক্ষেও।

আর এই বিপদ নিছক সাধারণ দুর্ঘটনা বা রোগের নয়। তা লিউকিমিয়া ও ক্যান্সার, জিনগত বিকৃতি ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ইত্যাদির মত অসাধারণ। অজস্র সমীক্ষায় এটি প্রতিষ্ঠিত যে, এই ধরনের পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে লিউকিমিয়া ও ফুসফুস সহ নানা অঙ্গের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগ বেশি। তেজস্ক্রিয়তায় বিপর্যস্ত হয় বিস্তীর্ণ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশও। আর এসবের রেশ থাকে দু'চার বছর নয়, কয়েক শত বছর।

আর যদি চেরনোবিলের মত দুর্ঘটনা ঘটে তবে তো কথাই নেই। ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিলের ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯৩,০০০ জন। আক্রান্ত হয়েছেন এলাকার প্রায় এক কোটি মানুষ। বছর দশেকের মধ্যেই আশপাশের শুধু শিশুদের মধ্যে কোন কোন এলাকায় থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে ২০০ গুণ বেশি সংখ্যায়। এবং ওই চেরনোবিলের ২০ বছর পূর্তিতে 'পরমাণু শক্তি মানেই শক্তি সমস্যার সমাধান' জাতীয় কুসংস্কারের পাল্লায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে আরেক চেরনোবিলের আঁতুড়ঘর বানানোর কাজ। তবে ব্যাপারটি নিছক হয়তো কুসংস্কার নয়। হয়তো রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর ব্যবসায়িক আর তুষ্টি সাধনের বাধ্যবাধকতা এবং হয়তো বা পরমাণু অস্ত্রের গভীর গোপন বাসনা। পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে যে ধরনের চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় তাতে এই ধরনের সন্দেহও অমূলক নয়।

অথচ বিস্তীর্ণ ওই সমুদ্রবেলায় বায়ু, সমুদ্রের ঢেউ, সূর্যালোক, ভূচৌম্বকত্ব ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিরাপদ ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তার উপর গবেষণা। পৃথিবীর বহু দেশই এখন যখন নতুন করে পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বানানোর ব্যাপারটি বাতিল করছে, তখন ওই বাতিল হওয়া চিন্তা আর প্রকল্প এদেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার এই ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক।

মেদিনীপুরের ওই এলাকায় আমার পৈতৃক বাসস্থান। সেই মাটির টানে, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই মাটি, মানুষ আর এলাকার অসাধারণ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত রাখার আবেদন জানাচ্ছি। যতদিন না গবেষণার মাধ্যমে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া নিরাপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ততদিন পরমাণু শক্তির চক্করে দয়া করে পড়বেন না। শ্মশানে বসে ফ্যানের হাওয়া আমরা খেতে চাই না।

*— ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু*

কলকাতা আকুপাংচার মেডিকেল কলেজ

১৩ সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৬

## রেবে অরুণাচলের সম্পদ

১ পাতার পর

ছিল রেবে। যা দিয়ে জোঁক প্রতিরোধ করা হত। এই রেবের ভেষজ গুণ এবং জোঁক প্রতিরোধের ক্ষমতা নিয়ে কারেন্ট সায়েন্স (Current Science) ভল্যুম ৯১, সংখ্যা ৮ এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জানিয়েছেন বিজ্ঞানী কুমার অম্বরীশ।

অরুণাচলের পাহাড়ের ৬০০ মি. উচ্চতায় এবং ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং খানিকটা স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে এই রেবে উদ্ভিদ জন্মাত। এই উদ্ভিদ এবং পরিবেশ নিয়ে তথ্য ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ সি বি ক্লার্ক বিশ্বের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বইতে প্রথম নথীভুক্ত করেন।

কুমার অম্বরীশ জানিয়েছেন, ২০০৪ এ গবেষকরা এই উদ্ভিদের ফুল এবং ফলকে লক্ষ্য করেছেন। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৫ নামদাফা জাতীয় উদ্যানে দুটো পাপড়ি নিয়ে এবং দুটো sepal নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে এটাকে ফুটতে দেখেন এখনকার বিজ্ঞানীরা এবং এই রেবের উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত হন। এই রেবের প্রাপ্তি বা দেখার পর এটাকে মেলাবার কাজ শুরু করেন বিজ্ঞানীরা। একশো বছর আগের গাছের সঙ্গে এখনকার গাছের মিল কতটা, এটাই দেখার কাজ করেন বিজ্ঞানীরা।

বাস্তবে অরুণাচল প্রদেশই হল রেবের উপযুক্ত স্থান। তবে যেটুকু রেবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেটাও এখন হারিয়ে যাবে। বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব কারণে এটা হারিয়ে যাবে। এর ৩০ সেমি লম্বা পাতা আদিবাসীরা রান্না করেও খেয়ে থাকে আবার কাঁচাও গ্রহণ করে থাকে।

অম্বরীশবাবু আরও বলেছেন যে দুটো রেবের চারাকে তারা শিলং এ নিয়ে এসেছিলেন তার একটা চারা বাঁচেনি। কারণ হিসেবে শিলং এবং অরুণাচলের ভৌগলিক অবস্থার তারতম্যের জন্য এটা ঘটে থাকবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। লক্ষণীয় দুটোই পাহাড়ী জলবায়ু সমন্বিত স্থান হলেও অরুণাচলের বিশেষ তাপমাত্রা ও বায়োটিক কারণই রেবেকে বাঁচিয়েছে। প্রকৃতিতে সূক্ষ্মতা কত গুরুত্বপূর্ণ এর দিকে তাকালে বোঝা যাবে। রেবেকে দেখা যায়নি, তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল রেবে হারিয়ে গিয়েছে। রেবেকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন। পেটের অসুখের মূল্যবান ওষুধ পাওয়া যাবে রেবে থেকে। দামী দামী বহুজাতিক সংস্থার ওষুধের চাপ থেকে আমজনতাকে বাঁচাবার জন্য সরকার ভাবতে পারে।

*—শান্তনু বসু*

# পৃথিবীর কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ নয়

আমরা শক্তির জন্য খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল, খনিজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সেজন্য বিকল্প শক্তি উৎসের সন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিকল্প শক্তি উৎস হিসাবে একসময় পরমাণু বিদ্যুৎকে মনে করা হয়েছিল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি দেশগুলি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, শক্তিসমস্যা সমাধানের আশায় পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করে। ফ্রান্সে একসময় সেদেশের মোট বিদ্যুতের ৭৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হত পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে। অথচ যে দেশে ১৯৯৮ সালের পর থেকে আর নতুন কোনও পরমাণু চুল্লী স্থাপন করা হয়নি। শুধু ফ্রান্স নয় প্রায় সমস্ত দেশই নতুন পরমাণু চুল্লীর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

**কিন্তু কি কারণে পিছু হটা?**

পিছু হটার কারণগুলি সংক্ষেপে — (ক) পরমাণু বিদ্যুতে অন্যান্য বিদ্যুতের তুলনায় খরচ অনেক বেশি। (খ) পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লী পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। যেমন ১৯৭৯-র ২৮শে মার্চ আমেরিকার থ্রিমাইল আইল্যান্ডে বা ১৯৮৬-র ২৬শে এপ্রিল রাশিয়ার চেরনোবিলে ঘটেছে ভয়াবহ পরমাণু চুল্লী বিস্ফোরণ। (গ) পরিবেশ তেজস্ক্রিয় দূষণ ও অন্যান্য দূষণে আক্রান্ত হয়। (ঘ) জীব জগৎ (প্রাণী ও উদ্ভিদ) কঠিন ও জটিল রোগের শিকার হয়। (ঙ) পরমাণু অস্ত্র তৈরির মশলা তৈরি হয় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

**এখন আমাদের কি করণীয়?** আমরা জীবনের তাগিদে, সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য পরমাণু বিদ্যুতের বিরোধিতা করব, যাতে পৃথিবীর কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা না হয়। তাহলে শক্তি সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে? তাও আছে, খুব ভাল সমাধান আছে। চেষ্টা করতে হবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের। পরিবেশের বায়ুকে কাজে লাগিয়ে বায়ু বিদ্যুৎ, সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করে সৌরবিদ্যুৎ, এইভাবে জোয়ার ভাঁটা শক্তি, ভূতাপ শক্তি ইত্যাদি শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে শক্তি সমস্যার খুব নিরাপদ সমাধান সম্ভব।

এই শক্তি উৎসগুলি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম, পরিবেশ দূষণ কম হয় এবং সর্বোপরি এগুলির ভাণ্ডার অফুরন্ত। একসময়ের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রণী দেশ ফ্রান্স এখনই ৫৩,৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছে।

আমাদের দেশেও বায়ু বিদ্যুতের ভাল সম্ভাবনা আছে। দীর্ঘ ৩৮ বছরের চেষ্টায় প্রচুর ব্যয় করে পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ মাত্র ২৯৬১ মেগাওয়াট। অথচ মাত্র ২০ বছরের কম সময়ের চেষ্টায় বায়ুবিদ্যুৎ থেকে বছরের প্রায় ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকি। যেটা ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭৩০ মেগাওয়াট-এ। একইরকম সম্ভাবনা আছে জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, জোয়ারভাঁটা শক্তি ইত্যাদি অপ্রচলিত শক্তি উৎসগুলির। পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ অপ্রচলিত শক্তি উৎসের দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের জন্য একটা করে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। যেমন, জার্মানী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে যে তারা ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুতের ২৫ শতাংশ উৎপাদন করবে অপ্রচলিত শক্তি উৎস থেকে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে ১৫ শতাংশ। এইরকম উন্নত দেশগুলি ২০১২-১৫ সালের মধ্যে অপ্রচলিত শক্তি থেকে প্রায় ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

শুধু হরিপুর কেন, পশ্চিমবঙ্গের এমনকি সমগ্র বিশ্বের কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা চলবে না। আগামী বিশ্বকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের নিরাপদ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে (জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ বায়োমাস ইত্যাদি) সুসংহত প্রকল্পের মাধ্যমে শক্তি সমস্যার সমাধান করতে হবে।

*— পান্নালাল মানি*

---

# যদি পরমাণু যুদ্ধ হয়

**পরিমল বৈদ্য**

যদি একবার পরমাণু যুদ্ধ হয় — জেনো নিশ্চয়
হারিয়ে যাবে বৈচিত্র্যময় এ সবুজের মেলা
পরমাণুসৃষ্ট অগ্নিশিখা বস্তুজগতের উর করবে খেলা
নিভে যাবে জীবন দীপ
ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে যাবে প্রেমের নীপ, —
এত যে স্মৃতিসৌধ, এত যে শিল্পরাশি
শব হয়ে ভগ্নস্তূপে শুয়ে থাকবে পাশাপাশি
লক্ষ বছরের অভিব্যক্তি হবে নিষ্ফল
একেবারেই হারিয়ে যাবে বিবর্তনের ফসল —
পুষ্করিণী শুকিয়ে যাবে, নদীস্রোত অদৃশ্য হবে
বাষ্প হবে যা কিছু জলরাশি স্থলভাগে
পুড়ে যাবে সব ফুল যারা ফুটে আছে ফাগে —
দাউ দাউ জ্বলে যাবে বাড়ি-ঘর
ধুঁয়োয় ভরে যাবে বায়ুস্তর
তারপর নামবে অ্যাসিড বৃষ্টি
কল্পনাতেও লাগে ভয় এমনই অপসৃষ্টি
স্বপ্নের উপর খেলা করবে কল্পনার লাখো প্রেত
হয়ে যাবে কালো অথবা ছাইরূপ যা কিছু রঙিন শ্বেত!

এই যে জনদ বাড়ি-ঘর-অট্টালিকা
অরণ্যসম্পদ, ফুল-ফল স্নিগ্ধ লতিকা
তার ধ্বংসস্তূপের কে নেবে দখল
যা কিছু সুন্দর আছে অথবা নকল
কার হবে এত ভূমি
অনুর্বর উর্বর মত আছে জমা জমি
কি হবে কোটি কোটি মন খনিজ, সোনা দানার —
কে করবে দাবী
পড়ে থাকা স্থলযান অথবা আকাশযানের চাবি?

এখানে বসে দেখছি যে পর্বতের সারি
কেউ কি দেখেছো ভেবে কি রূপ হবে অনুপম তারি
কি রূপ হবে ধরিত্রী মাতার —
জীবনশূন্য এ পৃথিবীতে কে দেবে সাঁতার!

পরমাণুকে তুমি ভালোবাসো না, আমিও না
তবুও তো অনেকেই পরমাণু নিয়ে মশগুল
গড়তে ব্যস্ত আঘাত হানার কালান্তক শূল —
কত না অনর্থক শ্রম, লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় হয়
অগ্নিমুখ পতঙ্গেরা পেছতে রাজি নয়;
বেড়ে যাচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞের বনিয়াদ
দ্রুত কমছে মূল্যবোধের মেয়াদ —

ধ্বংসের জন্য এত বরাদ্দ কেন
গণমৃত্যুর মিছিল বানাতে এত উদ্যোগ কেন
উন্মাদ কেন বিশ্বের তাবড় পরিচালকেরা
কেন এ পৃথিবীর সমস্ত জনপদ ক্ষেপণাস্ত্রে ঘেরা?
লক্ষ বছরের শ্রম ও চিন্তায় সেজেছে এ ধরা —
একে মহাশ্মশান বানাতে এত ব্যস্ত কারা?
শিল্পী যারে শিল্প দিয়ে সাজিয়েছে
কবি যাকে নিয়ে মহৎ কবিতা বানিয়েছে
সুবিজ্ঞানী দিয়েছে তাঁর সব সাধনার ধন
এসবের দিকে কু-দৃষ্টি তো সভ্যতার অপমান!

কিছুতেই বোঝে না হৃদয়
এত পাষণ্ড মানুষ কি করে হয় —
কেন সাজানো জনপদে কোপদৃষ্টি পড়ে
কেন মাতালের মত সহস্র টন ক্ষেপনাস্ত্র গড়ে?
কি লাভ তাদের, — অন্তরে কোন অনুভব
সৃষ্টি জীবনশূন্য হলে অন্ধকারে ডুবে গেলে সব
কি পাবে তারা, পরমাণু বোমার প্রেমিকেরা?

যদি একবার পরমাণু যুদ্ধ হয় — জেনো নিশ্চয়
যা কিছু উঠেছে গড়ে একাল অবধি
সমস্ত স্বপ্নের তবে নিশ্চিত সমাধি!

# প্রশ্নোত্তর

**২৯.০১.০৭ কলাবাগান হাইস্কুল, কোচবিহারে বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পর্যায় আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১৫ টি স্কুলের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই সংখ্যায় অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যালেরিয়া ও জলাতঙ্ক বিষয়ে কিছু প্রশ্নের সেরা উত্তর ছাপান হল (সামান্য সংশোধন সহ)**

*— সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক।*

**প্র : ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য (অ) মশা নিয়ন্ত্রণ, (আ) অপর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা করা এবং (ই) সমস্ত রকমের প্লাসমোডিয়াম প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলা — এই তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি সবচাইতে কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত, কোনটি একেবারেই অসম্ভব এবং কোনটি হাতের কাছে রাখতেই হবে।**

উ : ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য মশা নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত।

এদের মধ্যে সমস্ত রকমের প্লাসমোডিয়াম প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলা সব থেকে অসম্ভব।

'পর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা করা' একেবারে হাতের কাছে রাখতেই হবে।

**প্র : তোমাদের মতে যে ব্যবস্থাটি সবচাইতে কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত তাকে সফল করার জন্য গ্রামে ও শহরে কোন্ সংস্থার ভূমিকা সবচাইতে বেশী? এবং কিভাবে এটিকে কার্যকরী করা যাবে?**

উ : আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকদের এই ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বলতে হবে এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকার করার জন্য তাদের সচেষ্ট করে তুলতে হবে।

বাড়ির চারপাশে যেসমস্ত জায়গায় জল জমে সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার করতে হবে।

মশার ডিম ও লাভা ইত্যাদিকে ধ্বংস করার জন্য বিশেষ কয়েকপ্রকার মাছ চাষ করতে হবে। যেমন, খলসে, তেচোখ ইত্যাদি।

অবশ্যই শোবার সময় মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে।

*—সুধাকর ভৌমিক, অষ্টম শ্রেণি*
*শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল*

**প্র : 'প্রতিবছরই তার আগের বছরের তুলনায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে' ... এই ঘটনা থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পার? যুক্তিসহ আলোচনা কর।**

উ : 'প্রতিবছরই তার আগের বছরের তুলনায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে'— এই ঘটনা থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি সেটা হল — (১) ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে অর্থাৎ তার প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে সবাই সঠিক জানে না।

(২) যেখানে বেশি পরিমাণে মৃত্যু হচ্ছে সেখানকার চিকিৎসা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ নেই।

(৩) ম্যালেরিয়া রোগ হলেও কেউ উপযুক্ত চিকিৎসা করায় না।

আমি মনে করি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ সেই এলাকায় থাকে তাহলে চিকিৎসা কেন্দ্রে গেলে সহজেই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এছাড়াও উপযুক্ত চিকিৎসা করালেও এই রোগের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব। যদি সবাই এই রোগ সম্বন্ধে জানে তাহলে খুব সহজেই এই রোগের থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

*—প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, অষ্টম শ্রেণি,*
*কলাবাগান হাইস্কুল*

**প্র : জলাতঙ্ক রোগের জীবাণুর নাম কি এবং এটা কোন প্রাণীর লালাতে থাকে?**

উ : জলাতঙ্ক রোগের জীবাণুর নাম 'রেবিস ভাইরাস'।

এই জীবাণু কুকুর, বিড়াল এবং শেয়ালের লালাতে থাকে। এরা 'রেবিস' জীবাণুর বাহক।

**প্র : জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধকের ও আবিষ্কারকের নাম কি?**

উ : জলাতঙ্ক প্রতিষেধকের নাম হল 'অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন।'

এবং ইহা ডক্টর লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন।

**প্র : কুকুরে কামড়ানোর পর যেসব মানুষকে থালাপড়া, ন্যাবার মালা দেওয়া হয় তাদের মধ্যে কারা ভাল হয় এবং কারা মারা যায়?**

উ : কুকুরে কামড়ানোর পর যেসব মানুষকে থালা পড়া, ন্যাবার মালা দেওয়া হয় তাদের মধ্যে সকলেরই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এটা পরিষ্কার বলা যায় যে প্রতিবছরই বহু মানুষকে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ড. লুই পাস্তুরের আবিষ্কারের আগে যারা জলাতঙ্কে মারা যেত তাদের জন্য কিছুই করার ছিল না। কিন্তু এখন সময় মতো প্রতিষেধক নিতে পারলে জলাতঙ্কে রোগের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি এই প্রতিষেধক দিয়ে কুকুরকেও নির্বিষকরণ করা যায় অর্থাৎ ওই কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হবে না। এর ফলে অনেকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

তবে ওঝার তুলনায় ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত দরকার। কারণ ডাক্তারবাবুর কাছে কুকুর কামড়ানো রোগীকে নিয়ে গেলে ১০০ শতাংশ লোক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

**প্র : তোমাদের মতে জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?**

উ : আমার মতে জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সেগুলি হল—

(ক) যেসমস্ত মানুষকে কুকুরে কামড়ায় তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে অর্থাৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এবং সময়মতো জলাতঙ্কের প্রতিষেধক (অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন) দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(খ) ডাক্তারবাবু যেসব পরামর্শ দেবেন সেই পরামর্শ যথাযথভাবে পালন করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত।

(গ) কুকুরকে প্রতিষেধক দিয়ে নির্বিষকরণ করতে হবে। যাতে কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ না হয়।

*—মিন্টু হোসেন, সুপ্রদীপ পাল,*
*নবম শ্রেণি। কলাবাগান হাইস্কুল*

*যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।*
*সম্পাদক মণ্ডলী— সুবর্জিৎ পাল, পান্নালাল মানি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুবর্জিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।*

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.